ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা ॥ সংখ্যা ১০৬ ও ১০৭ (যুক্ত), ডিসেম্বর ২০২৫
ISSN : 2411-9059, e-ISSN: 3006-3078 DOI : http://dx.doi.org/10.62296/DVP/10607/018

ধাতুপাতে ইলেকট্রোবাইট এচিং পদ্ধতিতে ছাপচিত্র সৃজন: শৈল্পিক উপযোগিতা অনুসন্ধান

ঝোটন চন্দ্র রায়*

সারসংক্ষেপ: In this article, the technology involved in Electrobite etching on metal plates and its artistic feasibility has been investigated. Electrobite etching is a state-of-the-art technology, which utilizes electricity and chemical reactions to create delicate images on metal plates. The artistic quality of printed images is determined mostly based on the skillful application of the technique, upon which the acceptability of the image as an artwork depends. 'Etching' is considered as an important technology among the various alternative techniques applied in printmaking. However, in this technique, the images are created by the corrosion of the metal achieved using nitric acid which is harmful for both health and environment. In comparison to conventional etching, Electrobite etching is safer and environmentally friendly. In addition, this technique is very effective in creating delicate lines and different textures. Despite these advantages, the Electrobite etching technique has not been applied yet in Bangladesh, especially in academic work. Hence, the researcher of this study started applying this technique experimentally and presented the result based on the application of this technique on the artwork of forty artists in this study. The focus of the study is on investigating whether the Electrobite etching technique has artistic feasibility in creating visual images. In addition, the artworks of nine artists who are prominent printmaking specialists and current students (three artworks from each) are discussed in this article in terms of the aesthetic standards of the visual characteristics.

মুখ্যশব্দ: ইলেকট্রোবাইট এচিং, শৈল্পিক উপযোগিতা, দৃশ্যগত বৈশিষ্ট্য, ছাপচিত্রের নান্দনিকতা।

* প্রভাষক, প্রিন্টমেকিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১. ভূমিকা

দৃশ্যশিল্পে প্রিন্টমেকিং বা ছাপচিত্র প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী একটি শাখা হিসেবে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে এই মাধ্যমটি চারুশিল্প ও বাণিজ্যিক– এই দুই ক্ষেত্রে আলাদা গুরুত্ব বহন করে। প্রাতিষ্ঠানিক এবং বাণিজ্যিক উভয় ক্ষেত্রেই ছাপচিত্র তৈরির জন্য এর উপকরণ ও করণ-কৌশল প্রধান ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে ছাপচিত্র শৈলীর বিভিন্ন কৌশলের চর্চা রয়েছে, যেমন: রিলিফ পদ্ধতি (relief process), এচিং বা ইন্টাগ্লিও পদ্ধতি (intaglio process), প্লানোগ্রাফিক পদ্ধতি (planographic process) ইত্যাদি। উল্লিখিত প্রতিটি মাধ্যমে কৌশলগত কারণে চিত্রে ভিন্ন ভিন্ন আমেজ সৃষ্টি হলেও এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ করণ-কৌশল হিসেবে মূলত 'এচিং' পদ্ধতিকেই চিহ্নিত করা হয়। কারণ অন্য মাধ্যমগুলোর তুলনায় এই মাধ্যমে নিরীক্ষামূলক শিল্পকর্ম তৈরির সুযোগ সবচেয়ে বেশি। বিশেষ করে ইমেজে সূক্ষ্ম (sharp) রেখা এবং বিভিন্ন টেক্সচার তৈরির ক্ষেত্রে এই মাধ্যম বেশ কার্যকরি। বাংলাদেশে প্রচলিত বা অ্যাকাডেমিক দিক থেকে সাধারণত বিভিন্ন ধরনের অ্যাসিড, যেমন: নাইট্রিক অ্যাসিড, ফেরিক ক্লোরাইড, সালফিউরিক অ্যাসিড ব্যবহার করে ধাতুপাতে 'এচিং'-এর মাধ্যমে ছাপাই ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়। কিন্তু এতে এচিং পদ্ধতির মানদণ্ড নিশ্চিত হলেও এর ফলে বিষাক্ত ধোঁয়া, বিপদজনক বর্জ্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ ও পরিবেশের জন্য হুমকি স্বরূপ হয়ে দেখা দিতে পারে। অপরদিকে ইলেকট্রোবাইট এচিং পদ্ধতি পরিবেশবন্ধব। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন স্বাস্থ্য ঝুকি কমানো যায়, পাশাপাশি এটি সহজলভ্য ও পুনরায় ব্যবহারযোগ্য; যা অবিষাক্ত (non-toxic) দৃশ্যগত (visual) ছাপচিত্র তৈরির ক্ষেত্রে বেশি মাত্রায় উপযোগী। এই লক্ষ্যেই মূলত বর্তমান গবেষণার বিষয় হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে– ধাতুপাতে 'ইলেকট্রোবাইট এচিং' পদ্ধতি। এই পদ্ধতির শৈল্পিক উপযোগিতা অনুসন্ধানের মাধ্যমে নতুন ধরনের কৌশল আবিষ্কার করে বাস্তব ক্ষেত্রে এর ব্যবহার কতটা ফলপ্রসূ তা নির্ণয় করাই এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে ইলেকট্রোবাইট এচিং প্রক্রিয়ার যোগ্যতা, ক্ষমতা ও পরিসীমা যাচাইকরণ এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক, অ-প্রাতিষ্ঠানিক, ব্যক্তিগত স্টুডিও ছাপচিত্র এবং পাশাপাশি বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ছাপচিত্রের উন্নতি সাধন করার একটি প্রচেষ্টা-ই বর্তমান আলোচনার প্রতিপাদ্য বিষয়। পাশাপাশি প্রত্যাশিত ফলাফল অনুযায়ী চিত্রে উপস্থাপিত দৃশ্যগত বৈশিষ্ট্যের নান্দনিকতার মানদণ্ড বিচারও সমানভাবে আলোচিত হয়েছে। এর ফলে নতুন সংযোজন ও বিকাশের মধ্য দিয়ে ছাপচিত্রের শিল্পের দিকটি একদিকে যেমন ভিন্ন মাত্রায় উন্নীত হবে, অন্যদিকে বিশ্ববাজারে সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রটিকেও করে তুলবে অধিক মাত্রায় ব্যবসাসফল।

২. এচিং পরিচিতি ও এর করণ-কৌশল

ছাপের মাধ্যমে শিল্পকর্ম তৈরির একটি প্রক্রিয়া হলো– 'ছাপচিত্র'। সহজ কথায়, এটি বিষয়বস্তুর অনুকৃতি নির্মাণের একটি পদ্ধতি। পরবর্তী সময়ে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী পদ্ধতিটি পরিবর্তিত হতে থাকে। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন উপাত্তের ভেতর এর ব্যপক ব্যবহার শুরু হয় এবং তা ধীরে ধীরে শিল্পকলার জগতেও শক্তিশালী, স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ভাষার দাবি নিয়ে শিল্পীদের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। বর্তমান আলোচনার মূল বিষয়বস্তু 'এচিং' মূলত ছাপচিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি, যেখানে ধাতুপাতের ওপর অ্যাসিড বা অন্য রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে এচিং পদ্ধতিতে বিভিন্ন ছাপচিত্র তৈরি করা হয়।

এচিং-এর সূত্রপাত হয় জার্মানি এবং ইতালিতে, সমসাময়িক সময়ে (Colin, 2009, p. 07)। শিল্প বিপ্লবের পর বাণিজ্যিকভাবে মুদ্রণশিল্পে 'এচিং' মাধ্যমের প্রচার ও প্রসার ঘটে। মূলত বাণিজ্যিক এবং পুনরুৎপাদনের লক্ষ্যে সহজলভ্যতার কারণে 'এচিং' পদ্ধতি শিল্প রচনার প্রধানতম মাধ্যমে পরিণত হয় (রশীদ, ২০০৭, পৃ. ১৫০–১৫১)। ফলে মাধ্যমটি নবীন শিল্পীদের মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং এটি ছাপচিত্রের তাৎপর্যপূর্ণ একটি কৌশল হিসেবে সক্রিয়ভাবে বিবেচিত হতে থাকে। এই মাধ্যমের ক্ষেত্রে জমিন (surface) হিসেবে বিভিন্ন ধরনের ধাতুর পাত, যেমন: তামা, পিতল, অ্যালুমিনিয়াম, লোহা ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। তবে এক্ষেত্রে তামা'র প্লেট ছাপচিত্রের সূক্ষ্মতাকে সবচেয়ে বেশি প্রসারিত ও সহজতর করে তোলে। এচিং পদ্ধতি কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন করা হয়–

১. ধাতুপাত পরিষ্কার করে তাতে রেজিস্ট প্রলেপ (coating) দেয়া হয়। এই প্রলেপকে প্রিন্টের ভাষায় ওয়াক্স গ্রাউন্ড (wax ground) বলা হয়।

২. প্রলেপকৃত অংশে এক ধরনের সূচালো নিডল্ (niddle) দিয়ে আঁচড়ের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত চিত্রটি সৃজন করা হয়।

৩. পাতের বিপরীত অংশে প্লাস্টিক অথবা বিটুমিন (আলকাতরা) দিয়ে প্রলেপ দিয়ে অ্যাসিড পাত্রে পাতটিকে চাহিদা অনুযায়ী ডোবানো হয়। এভাবে ডুবন্ত পাতের সৃজনকৃত অংশকে অ্যাসিড বাইট করানো হয়।

৪. নির্দিষ্ট সময় পরে ধাতুর পাতকে ঠাণ্ডা পানিতে ধুয়ে কেরোসিনের মাধ্যমে প্রলেপটিকে তুলে বেকিং সোডা দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করা হয়।

৫. ধাতুপাতে মুদ্রণের কালি লাগিয়ে ছাপ দেয়ার মেশিনে ছাপার কাজটি সম্পন্ন করা হয়।

ইলেক্ট্রোবাইট এচিং হলো– এক ধরনের আধুনিক, সাশ্রয়ী এবং নান্দনিক খোদাই পদ্ধতি। এটি ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল এচিং পদ্ধতি নামেও পরিচিত, যা বিদ্যুৎ ও রাসায়নিক দ্রবণ (জিংক

সালফেট)-এর মাধ্যমে ধাতবপাতে নকশা, চিত্রকর্ম বা লেখা ফুটিয়ে তোলা হয় (Alfonso & Bob, 2013o, p. 01) এই পদ্ধতিতে সৃজনকৃত চিত্রের নান্দনিকতা মূলত রেখার সূক্ষ্মতা, টেক্সচার (texture), টোনাল ভ্যালু (tonal value), স্থায়িত্ব (longibility) ইত্যাদির মাধ্যমে নিখুঁত নকশা সৃজনের ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে। সহজভাবে বলা যায়, ইলেকট্রোবাইট এচিং-এর মাধ্যমে মসৃণ, নিয়ন্ত্রিত এবং প্রায় ফটো-প্রিন্টের মতো পরিপূর্ণ ফল পাওয়া যায়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নাইট্রিক অ্যাসিড ব্যবহৃত ধাতুপাতে এচিং পদ্ধতি ক্ষতিকারক হলেও জনপ্রিয়। কারণ ছাপচিত্র তৈরির ক্ষেত্রে এটি দ্রুততম সময়ে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায়। তাই বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে পরিবেশ বান্ধব 'ইলেকট্রোবাইটিক এচিং' ছাপচিত্রের ক্ষেত্রে অনন্য এক উদাহরণ হতে পারে। পাশাপাশি নান্দনিকতা বজায় রেখে তা ব্যবহারে উপযোগী হয়ে উঠতে পারে। 'ইলেকট্রোবাইটিক এচিং' প্রক্রিয়া পূর্বে উল্লেখিত অ্যাসিডে ক্ষয়প্রাপ্ত এচিং-এর পক্রিয়ার মতই, তবে এখানে অ্যাসিডের পরিবর্তে ধাতুপাতের নির্দিষ্ট অংশ বৈদ্যুতিক প্রবাহের মাধ্যমে ক্ষয় করিয়ে বিভিন্ন চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়। ল্যাবভিত্তিক গবেষণায় দেখা যায়, ইলেক্ট্রো-এচিং ছাপচিত্রে ফেরিক ক্লোরাইড বা নাইট্রিক অ্যাসিডের সমমান বা উন্নত ফল দিতে পারে। পাশাপাশি ফটো এচিং-এর ক্ষেত্রেও এই মাধ্যম ভালোভাবে কাজ করে। যেহেতু বাংলাদেশে 'ইলেক্ট্রোবাইট এচিং' পদ্ধতি ছাপচিত্র ও বাণিজ্যিক মুদ্রণ শিল্পে এখন পর্যন্ত প্রয়োগ হয়নি, তাই প্রচলিত এচিং-এর বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে এই মাধ্যমকে বর্তমান আলোচনায় গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

৩. পূর্ব সম্পাদিত গবেষণার পর্যালোচনা

বাংলাদেশে ইলেকট্রোবাইট এচিং পদ্ধতি নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনো গবেষণা হয়নি। এমনকি এখানে অ্যাকাডেমিকভাবে ছাপচিত্রে এই পদ্ধতির চর্চা এখনও শুরু হয়নি। তবে বাণিজ্যিকভাবে পূর্বে এই পদ্ধতির কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এদেশে এই পদ্ধতির চর্চা দেখা না গেলেও পাশ্চাতে ১৯৮০-এর পর থেকে অ-বিষাক্ত (non-toxic) আন্দোলন শুরু হয়। আন্তর্জাতিকভাবে এই আন্দোলনটির সূত্রপাত হয় এই দশকের মাঝামাঝি সময়ে এবং প্রথম দিকের গবেষকরা প্রথাগত প্রিন্টমেকিং-এ ব্যবহৃত বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের বিকল্প খুঁজে বের করতে শুরু করেন (Liz, 2009, p. 02)। এ বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে স্প্যানিশ শিল্পী আলফনসো ক্রুজেরা (Alfonso Crujera)-র নামের উল্লেখ রয়েছে সবচেয়ে বেশি। বিভিন্ন সময়ে তিনি নিজে এবং কখনও অন্য গবেষকদের সাথে যৌথভাবে ইলেকট্রোবাইট এচিং নিয়ে গবেষণা করেছেন।

আলফনসো ক্রুজেরা (Alfonso Crujera) রচিত 'Electro-etching made easy' এবং আলফনসো ক্রুজেরা (Alfonso Crujera) ও বব পার্কিন (Bob Perkin)-এর যৌথ প্রকাশনা 'The basis of Electro-etching : a simplified explanation'– মূলত এই

দুই গবেষণার মাধ্যমে সর্বপ্রথম পরিবেশবান্ধব এচিং হিসেবে ইলেকট্রো-এচিং অ্যাকাডোমিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা পায়। এক্ষেত্রে ধাতুপাত হিসেবে কপার প্লেট এবং লবণ হিসেবে ব্যবহার করা হয় কপার সালফেট। এখানে চিত্রে অ্যাকুয়াটিন্ট প্রয়োগের মাধ্যমে রেখা ও টেক্সচার ফুটিয়ে তোলা হয়। এই গবেষণার মাধ্যমেই মূলত ইলেকট্রো এচিং-এর স্থিতিশীলতা ও পুনঃব্যবহার প্রাধান্য পায় (Alfonso & Bob, 2013)।

আলফনসো ক্রুজেরা (Alfonso Crujera) রচিত বই 'Electro-etching Handbook'-তে ইলেকট্রোবাইট এচিং পদ্ধতির করণ-কৌশলের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। এক্ষেত্রে ধাতুপাত হিসেবে কপার প্লেট, জিংক প্লেট, আয়রণ প্লেট ও সিলভার পাতের উল্লেখ পাওয়া গেলেও ইমেজ তৈরির ক্ষেত্রে শুধু কপার প্লেটের উল্লেখ রয়েছে। এখানে মূলত রেখার সূক্ষ্মতা ও টেক্সচারকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে (Alfonso, 2018)।

ক্যানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জেসন স্কুয়েলা (Jason Scuilla) এবং মাইকেল ম্যাকমান (Michael McMann)-এর নেতৃত্বে দুইজন শিল্পী ও তিনজন রসায়নবিদ ইলেকট্রোবাইট এচিং পদ্ধতি ব্যবহার উপযোগী করা যায় কি না, তা নিয়ে একটি লেখা প্রকাশ করেন। এখানে তাঁরা মূলত রেখার সূক্ষ্মতাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন (Katharina; Jose; Asanka; Benjamin; Stefan; Jason, 2021, pp. 427–432)।

বার্নহার্ড কোচিয়ানসিগ (Bernhard Cociancig) রচিত 'E-Etching : Art Science craft'-তেও ইলেকট্রোবাইট এচিং পদ্ধতির করণ-কৌশলের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। এক্ষেত্রে ধাতুপাত হিসেবে কপার প্লেট, জিংক প্লেট ও আয়রণ প্লেট-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে ইমেজ তৈরি করা হয়েছে শুধু কপার প্লেটে। এখানে বিভিন্ন রেখা, টেক্সচারের পাশাপাশি বৈচিত্র্যময় রঙের ব্যবহার দেখা যায় (Bernhard, 2025)।

যদিও অ-বিষাক্ত পদ্ধতি নিয়ে পাশ্চাত্যে বিভিন্ন গবেষণার ক্ষেত্র দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেখানে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ছাপচিত্র শিল্পীগণ অ্যাসিডে ক্ষয়কৃত এচিং পদ্ধতির বিকল্প পদ্ধতির নতুন উপকরণে অনাগ্রহী। কারণ তাঁদের ধারণা বিকল্প পদ্ধতিতে তৈরিকৃত চিত্র প্রচলিত এচিং পদ্ধতির সমতুল্য হতে পারে না এবং আধুনিক প্রযুক্তিতে চিত্রের সূক্ষ্মতা আয়ত্মকরণে তাঁরা শিক্ষার্থী পর্যায়ে যেতে বাধ্য নন। এর ফলে অভিজ্ঞ ছাপচিত্র শিল্পীদের চিত্রকর্মে অ-বিষাক্ত পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটানো সম্ভব হয়নি (Liz, 2009, p. 04)।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক শোভন সোম রচিত 'শিল্পশিক্ষা ও ঔপনিবেশিক ভারত'– গ্রন্থে কোলকাতা গভর্ণমেন্ট আর্ট স্কুলে 'ইলেকট্রোটাইপিং' বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়– এই বিষয়ে সামান্য তথ্য পাওয়া যায় (শোভন, ১৯৯৮, পৃ. ২১১)।

কিন্তু এক্ষেত্রে উক্ত পদ্ধতিতে তৈরিকৃত চিত্রের কোনো নমুনা বা করণ-কৌশল সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

অতএব, পূর্ব সম্পাদিত গবেষণা পর্যালোচনা করে দেখা যায়– এক্ষেত্রে গবেষণাগারে ইলেকট্রোবাইট এচিং-এর করণ-কৌশল নিয়ে ফল নির্ণয় করে এর বিস্তারিত নথি তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু কোনো শিল্পীর চিত্রকর্মে এই পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটানো হয়নি। অর্থাৎ এই বিষয়ে প্রায়োগিক কোনোরূপ জরিপ চালানো হয়নি। ফলে উক্ত গবেষণার প্রায়োগিক শৈল্পিক উপযোগিতার বিষয়টি অনুপস্থিত রয়েছে, যা বর্তমান গবেষণার মাধ্যমে নতুন তথ্য ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে জ্ঞানের সম্প্রসারণ করার ক্ষেত্রে সুযোগ রয়েছে।

৪. বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের তাত্ত্বিক ধারণাসমূহ

বর্তমান গবেষণা পরিচালনার লক্ষ্যে কয়েকটি তত্ত্বের সাহায্য নেয়া হয়েছে, যা আলোচ্য বিষয়ের সাথে প্রাসঙ্গিক ও যৌক্তিক। যেমন:

ডিজাইন তত্ত্ব (design theory): এই তত্ত্বের মূল কথা হলো– দৃশ্যগত বিভিন্ন তথ্য পর্যবেক্ষণ এবং উপলব্ধি করার একটি পদ্ধতি; যেখানে গ্রাফিক ডিজাইনের উপাদান (রেখা, আকার, আকৃতি, রং, টেক্সচার ইত্যাদি) নির্ণয়, নিয়ম-নীতি (পুনরাবৃত্তি, অনুপাত, বৈপরীত্য, ভারসাম্য, ছন্দ, ফাঁকা স্পেস, ঐক্য ইত্যাদি) অনুধাবন, শ্রেণিবদ্ধকরণ এবং তা অনুশীলন করা হয়ে থাকে (Bryony, 2012, p. 21)।

ফর্মাল ভিজুয়াল তত্ত্ব (formal visual theory): ব্রিটিশ শিল্প সমালোচক ক্লাইভ বেল (Clive Bell)-এর এই তত্ত্বের মূল কথা হলো– শিল্পের নান্দনিকতা বিষয়বস্তু বা প্রেক্ষাপটের ওপর নয় বরং এর গঠনগত বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে (Clive, 1914 : 08)। অর্থাৎ শিল্পী তাঁর শিল্পে কী বলতে চান তার পরিবর্তে শিল্পের সৌন্দর্য, গঠন দর্শকের ওপর কী রকম প্রভাব বিস্তার করে তা ব্যাখ্যা করে। এটি দৃশ্যগত উপস্থাপনার গঠনগত উপাদান, যেমন: রেখা, রং, আকৃতি, টেক্সচার, স্থান দিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়।

ওয়েজ অব সিইং তত্ত্ব (ways of seeing theory): ব্রিটিশ শিল্প সমালোচক জন বার্জার (John Berger)-এর এই তত্ত্বের মূল কথা হলো– মানুষ যা দেখে তা তার জ্ঞান, বিশ্বাস এবং সামাজিক অনুশীলনের দ্বারা গঠিত (John, 1972, pp. 07–33)। অর্থাৎ, সংস্কৃতি, ইতিহাস, লিঙ্গ, শ্রেণি ইত্যাদি দেখার ধরনকে প্রভাবিত করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পকর্ম বা কোনো চিত্র দেখার সময় দর্শকের পূর্ব ধারণা ও সামাজিক প্রেক্ষাপট তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করে।

বর্তমান গবেষণায় উল্লিখিত তত্ত্বের সাহায্যে বিষয়বস্তু (contents)সমূহ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

৫. গবেষণা পদ্ধতি

প্রায়োগিক দিক বিবেচনায় বর্তমান গবেষণাটি 'পরীক্ষণ' (experimentation) পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে পরিচালনা করা হয়েছে। কারণ এই পদ্ধতিতে গবেষণাগুলি পরীক্ষাগারে অতি সতর্কভাবে পরিচালিত হয় (আকরাম উজ্জামান, ২০২০, পৃ. ৫১), যা বর্তমান গবেষণার প্রকৃতির সাথে সম্পৃক্ত। আলোচ্য গবেষণার উপাত্ত (data) হিসেবে ব্যবহৃত ছাপচিত্রের 'এচিং' প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যগুলো ইলেকট্রোবাইট এচিং পদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করে অ-বিষাক্ত ছাপচিত্র তৈরির মাধ্যমে বাস্তব সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পূর্বের এবং বর্তমানের পদ্ধতির ভিন্নতা ও মৌলিকতা প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে। এক্ষেত্রে নিরীক্ষার জন্য নাইট্রিক অ্যাসিডের পরিবর্তে রাসায়নিক দ্রব্য– জিংক সালফেট ও বিদ্যুৎ এবং ধাতু পাত হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে জিংক পাত। ইলেকট্রোবাইট এচিং পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ (পাঁচ থেকে দশ ভোল্টের, ক্যাথোড ও অ্যানোড সহযোগে) এবং পানিতে (১ লিটার) জিংক সালফেট (৩০০ গ্রাম) মিশিয়ে জিংক পাতকে ক্ষয় করা হয়েছে। অ্যাকাডেমিক ছাপচিত্র এচিং ল্যাব-এ মোট তিনজন সমসাময়িক অভিজ্ঞ ছাপচিত্র শিল্পী প্রায় এক বছর ধরে গবেষণাটি সম্পূর্ণ করেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন শিল্পীর মোট ৪০টি চিত্রকর্মের ওপর এই গবেষণার প্রায়োগিক বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। এর মধ্য থেকে বাছাইকৃত ০৯টি– স্বনামধন্য শিল্পী, সমসাময়িক ছাপচিত্র বিশেষজ্ঞ এবং অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মোট ০৩টি করে চিত্রকর্ম পর্যালোচনা করে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে বর্তমান আলোচনায়। উল্লিখিত প্রক্রিয়ার বিক্রিয়াসমূহের তাত্ত্বিক কাঠামো নিম্নরূপ–

সাধারণ জিংক প্লেট ঋণাত্মক ইলেক্ট্রোডে বিক্রিয়া :

$Zn^{2+}(aq) + e^{2-} \rightarrow Zn(s)$

চিত্রাঙ্কিত জিংক প্লেট ধনাত্মক ইলেক্ট্রোডে বিক্রিয়া :

$Zn(s) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + e^{2-}$

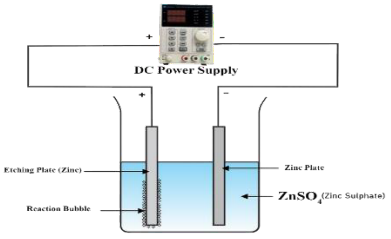

ইলেক্ট্রোবাইট পদ্ধতিতে এচিং ছাপচিত্র তৈরির প্রক্রিয়া (জিংকপাত)

অপরদিকে অনুসন্ধান প্রকৃতি বিবেচনায় আলোচ্য গবেষণাটি গুণগত (qualitative) গবেষণার অন্তর্গত। কারণ, উদ্ভাবিত নতুন দৃশ্যগত উপস্থাপনার গঠনগত উপাদান, যা উক্ত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন গবেষণার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এক্ষেত্রে ডিজাইন তত্ত্ব, ফর্মাল ভিজ্যুয়াল তত্ত্ব, ওয়েজ অব সিইং তত্ত্বের মাধ্যমে তৈরিকৃত দৃশ্যগত বৈশিষ্ট্যসমূহ পর্যালোচনা করে এর বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে প্রথম পর্যায়ে ছাপচিত্রে ব্যবহৃত বিভন্ন দৃশ্যগত উপাদান, যেমন: রেখা, আকৃতি, টেক্সচার, রং, স্পেস ইত্যাদি পরস্পরের সাথে নির্দিষ্ট অনুপাত, বৈপরীত্য, ভারসাম্য ও ঐক্যের সমন্বয়ে কী ধরনের চিত্র তৈরি করেছে, তা অনুসন্ধান করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ওয়েজ অব সিইং তত্ত্বের সাহায্যে অনুসন্ধানকৃত চিত্রের অন্তর্নিহিত বার্তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মূলত গবেষকের পূর্ব ধারণা, সামাজিক প্রেক্ষাপট, ভিজ্যুয়াল দৃষ্টিভঙ্গি ও মনস্তাত্ত্বিক বোধ উক্ত প্রক্রিয়ার জন্য প্রযোজ্য বলে বিবেচিত হয়েছে।

আলোচ্য গবেষণার তথ্য-উপাত্তের প্রাথমিক উৎস (primary source) হিসেবে বাংলাদেশের স্বনামধন্য শিল্পী, সমসাময়িক দক্ষ ছাপচিত্র বিশেষজ্ঞ (etcher) এবং অধ্যয়নরত ছাপচিত্র শিক্ষার্থীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও গ্রুপ ডিসকাশন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বৈতীয়িক উৎস (secondary source) হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত দেশি-বিদেশি অভিসন্দর্ভ/গবেষণাপত্র/গ্রন্থ/সাময়িকী/নথিপত্র ইত্যাদি।

৬. ইলেকট্রোবাইট এচিং পদ্ধতিতে প্রত্যাশিত ফল

ঐতিহ্যবাহী এচিং-এর রসায়নে নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার ওপর ভিত্তি করে ছাপচিত্রের মানদণ্ড নির্ধারিত হয়। যেমন: রেখার সূক্ষ্মতা, টেক্সচার, টোনাল ভ্যালু, বাইটের স্থায়িত্ব ইত্যাদি। দৃশ্যগত ছাপচিত্র তৈরির ক্ষেত্রে– অ্যাসিডে ক্ষয়কৃত এচিং পদ্ধতির মতো বিকল্প ইলেকট্রোবাইট এচিং পদ্ধতিতেও উক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহের মানদণ্ড আস্থাযোগ্য ও ধারাবাহিক ফল দিতে পারে কি না, তা-ই বর্তমান গবেষণার বিবেচ্য বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। এক্ষেত্রে বিকল্প ইলেকট্রোবাইট এচিং পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ৪০টি শিল্পকর্মের ব্যবহারিক শৈল্পিক উপযোগিতার অনুসন্ধানের ফল নিম্নরূপ–

আলোচ্য গবেষণার জন্য বাছাইকৃত প্রতিটি শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে চিত্রে উপস্থাপিত–

- **রেখা:** অ্যাসিডে ক্ষয়কৃত এচিং-এর মতোই দৃশ্যমান, বরং তুলনায় অনেক বেশি সূক্ষ্ম এবং স্পষ্ট। এর কারণ, ডিপ বাইট এচিং এবং এমবোসিং করার ক্ষেত্রে ইলেকট্রোবাইট এচিং উল্লম্ব ধরনের হওয়ায় রেখাগুলি তুলনামূলক বেশি গভীর ও তীক্ষ্মতর হয়।
- **টেক্সচার:** অ্যাসিডে ক্ষয়কৃত এচিং-এর মতোই দৃষ্টিগোচর হয়, বরং সেই তুলনায় বেশি প্রকট ও অধিক সংবেদনশীল।

- **টোনাল ভ্যালু:** অ্যাসিডে ক্ষয়কৃত এচিং-এর মতই উপলব্ধিযোগ্য।
- **বাইটের স্থায়িত্বকাল–** অ্যাসিডে ক্ষয়কৃত এচিং-এর তুলনায় ইলেকট্রোবাইট এচিং পদ্ধতি অনেক বেশি কার্যকর ও স্থায়িত্বসম্পন্ন। কারণ, অ্যাসিড-ভিত্তিক এচিং-এ বহুবার ছাপ নেওয়ার ফলে রেখাগুলোর সূক্ষ্মতা ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং চিত্রের তীক্ষ্ণতা হারিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু ইলেকট্রোবাইট এচিং পদ্ধতিতে রেখার গভীরতা অনেক বেশি হওয়ায় প্রত্যেকটি এডিশনে (addition) ছাপের সূক্ষ্মতা ও গুণগত মান অপরিবর্তিত থাকে, যা শিল্পীর কাঙ্ক্ষিত অভিব্যক্তিকে নিখুঁতভাবে ধরে রাখতে সক্ষম।

গবেষণার প্রাপ্ত ফলে উল্লিখিত ইতিবাচক দিক থাকলেও ইলেকট্রোবাইট এচিং পদ্ধতিতে একটি প্রতিবন্ধকতাও রয়েছে। এই পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ প্রবাহে প্লেট বাইট করানোর জন্য অনেক বেশি সময় দিতে হয়। কিন্তু এই বিষয়টি গৌণ হিসেবে বিবেচ্য হতে পারে, যেহেতু ইলেকট্রোবাইট পদ্ধতিটি সহজলভ্য, সাশ্রয়ী, ঝুঁকিমুক্ত এবং পরিবেশবান্ধব।

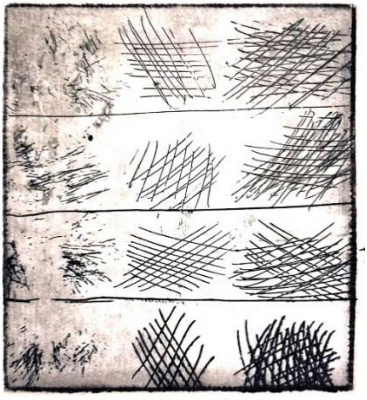

সময় অনুযায়ী (৫ ভোল্ট বিদ্যুৎ-এ) ইলেকট্রোবাইট এচিং পদ্ধতিতে প্রাপ্ত রেখার নমুনা

সময় অনুযায়ী (৫ ভোল্ট বিদ্যুৎ-এ) ইলেকট্রোবাইট এচিং পদ্ধতিতে প্রাপ্ত টোনাল ভ্যালুর নমুনা

৭. প্রত্যাশিত ফল অনুযায়ী গবেষণার বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ

শিল্পী নির্দিষ্ট কিছু চিন্তা-ভাবনা থেকে তাঁর নিজস্ব শৈলীতে শিল্পকর্ম করে থাকেন, যেখানে দর্শক সাধারণত এর সামগ্রিক গুণাগুণ অনুধাবন করতে প্রায় সময়েই সক্ষম হয় না। বিভিন্ন শিল্পকর্মে একাধারে যেমন দৃশ্যগত বৈশিষ্ট্যের সুষম উপস্থাপন চিত্রকে করে তোলে নান্দনিক,

তেমনি শিল্পীর মনোজগতের অজানা আবেগ, অনুভূতির ছায়াও বিদ্যমান থাকে সেখানে। পাশাপাশি ক্ষেত্র বিশেষে, সমসাময়িক সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক রূপকল্পের ধারণাও উপস্থাপিত হয়ে থাকে। উদাহরণ হিসেবে বাংলাদেশের বিভিন্ন সময়ের শিল্পীদের ইলেকট্রোবাইট এচিং-এর মাধ্যমে সৃজনকৃত নির্বাচিত মোট ০৯টি ছাপচিত্রের দৃশ্যগত বৈশিষ্ট্য পূর্বে উল্লেখিত তত্ত্বের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হলো। গবেষণাগারে পরীক্ষণকৃত ছাপচিত্রগুলো ২০২৪ সালে তৈরি করা হয়েছে। এগুলো অ্যাসিডমুক্ত ২২০ জিএসম ফেব্রিয়ানো রোজারপিনা (fabriano rojerpina)[২] কাগজে তৈরিকৃতি এবং প্রতিটি ধাতু পাত্রের মাপ ৬.৫ x ৫ সেমি. এবং এচিংকৃত ছাপ ৩৫/২ এডিশনযুক্ত।

➢ স্বনামধন্য শিল্পীদের রচিত ইলেকট্রোবাইট এচিংকৃত ছাপচিত্র

চিত্র ১

চিত্রটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমিরিটাস অধ্যাপক শিল্পী হাশেম খান রচিত। এখানে উপস্থাপিত দৃশ্যগত উপাদানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রতীয়মান হয়–

- বিষয়বস্তুর ড্রইং 'স্ক্রিবলিং' (scribbling) রেখা[১]য় উপস্থাপন করা হয়েছে। অর্থাৎ রেখাগুলো আপাতদৃষ্টিতে এলোমেলো, তবে প্রতিটি রেখা-ই সম্পূর্ণরূপে দৃশ্যমান। যার ফলে অসংগঠিত এবং দ্রুতগতিসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও রেখাগুলো প্রাণবন্ত ও গতিময়, যা দর্শক মনে স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতির জন্ম দেয়।

- অবিচ্ছিন্ন রেখা (continious line)[৩]-র মাধ্যমে জমিনকে পরিপূর্ণ করা হয়েছে, যাতে চিত্রে তৈরি হয়েছে এক ধরনের দ্বৈতমুখি মুখবয়বের আকৃতি, যা মানুষের চিরাচরিত দ্বন্দ্বের চলতি গল্পের ইঙ্গিত বহন করে।

- রেখাগুলো এমনভাবে বিন্যাস করা হয়েছে এবং তা এতটাই সূক্ষ্মভাবে ফুটে উঠেছে, যেখানে শুধু রেখা হিসেবেই এগুলি বিদ্যমান নয়, বরং এর মাধ্যমে এক ধরনের টেক্সচারও তৈরি হয়েছে।

- সুপরিকল্পিতভাবে পজিটিভ স্পেস (positive space)[৪] (কালো রেখা দ্বারা আবৃত অংশ)-এর সাথে নেগেটিভ বা হোয়াইট স্পেস (negative/white space)[৫] (ফাঁকা অংশ)-র সংযোগ স্থাপন করে সম্পূর্ণ চিত্রে এক ধরনের ভারসাম্য তৈরি করা হয়েছে।

- চিত্রে মুখাবয়ব দু'টি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে রং ও আলোছায়াবিহীন শুধু এক স্ট্রোক (stroke) রেখায়, যাতে উদ্ভাসিত হয়েছে অর্ধ বিমূর্ত (semi-abstract) এক রূপ। এর ফলে চিত্রের বিষয়বস্তু প্রতীয়মান হয়েছে এক ধরনের জটিল ও আত্মসংযোগের

প্রতীক হিসেবে, যা একদিকে দর্শককে চিত্রের মূল বিষয়বস্তু অনুধাবন করতে উৎসাহ যোগায়, অন্যদিকে এর মাধ্যমে তারা তাদের নিজস্ব ব্যাখ্যা খুঁজতেও উদ্যোগী হয়।

- মুখাবয়বের চারপাশে রয়েছে পর্যাপ্ত ফাঁকা স্থান (space), যা চিত্রের জটিল একঘেয়ে রেখার বিপরীতে দর্শক-দৃষ্টিকে দেয় এক ধরনের প্রশান্তি।
- নির্দিষ্ট রেখা ও ফাঁকা স্থানের পরস্পরের মধ্যে রয়েছে এক ধরনের ছন্দ (rhythm), যা দর্শকের মনে সংগীতের সুরের মতো মুগ্ধতা জাগায়। এখানে প্রতিটি রেখার বাঁক যেন একেকটি তাল ও লয়ের অনুরণন।

চিত্র ২

চিত্রটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমিরিটাস অধ্যাপক শিল্পী রফিকুন নবী রচিত। এখানে উপস্থাপিত দৃশ্যগত উপাদানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রতীয়মান হয়–

- বিষয়বস্তু এখানে ক্রস হ্যাচিং (cross-hatching)[৬] রেখায় উপস্থাপিত হয়েছে। এক্ষেত্রে রেখার ওপর স্বতঃস্ফূর্ত যে উপস্থাপন, যা যেকোনো কলম বা পেনসিল-এ তৈরিকৃত চিত্রের প্রতিফলন-এর মতই দৃশ্যমান হয়েছে। নাইট্রিক অ্যাসিডে ক্ষয়কৃত রেখার ভঙ্গুরতা এখানে নেই। ফলে চিত্রটিতে টেক্সচার ও টোনাল ভ্যালু তৈরি হয়েছে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে। এর মাধ্যমে চিত্রে আলো-ছায়ার অনুভূতি সৃষ্টি করে দর্শক মনে গভীর মানবিক অনুভূতি ও আবেগ সৃষ্টি করেছে, যা মাঝে মাঝে নাটকীয়তা, রহস্যময়তা, শান্তিকমলতা, ভয় ও অস্থিরতার পাশাপাশি মনকে কৌতুহলী করে তোলে নতুন কিছু জানার জন্য।
- সাধারণত প্রকৃতিতে দেখা যায় এমন সব বিষয়বস্তু বিভিন্ন ধরনের জ্যামিতিক আকৃতি (geomatrical shape) ও রেখার বহিঃরেখা (outline)[৭]-এ আঁকা হয়েছে। ফলে চিত্রে তৈরি হয়েছে সেমি রিয়েলিস্টিক (semi-realistic)-এর ধারা। এর মাধ্যমে বিষয়বস্তু সরলীকরণভাবে উপস্থাপিত হয়ে দর্শক মনে সহজভাবে চেনা ও জানার ক্ষেত্র তৈরি হয়।
- বিভিন্ন রেখার ঘনত্ব (line weight), অর্থাৎ চিকন ও মোটা রেখার মাধ্যমে সুকৌশলে আলোছায়ার গভীরতা (depth) ও পরিপ্রেক্ষিত (perspective) বোঝানো হয়েছে। এক্ষেত্রে অ্যাসিডে ক্ষয়কৃত এচিং-এর মতো রেখাগুলো দুর্বল না হয়ে বরং যে রেখার যে বৈশিষ্ট্য ঠিক সেরকমভাবেই ফুটে উঠেছে। ফলে খুব বেশি উপাদান ব্যবহৃত না হলেও এখানে পূর্ণাঙ্গ একটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের ভাব ফুটে উঠেছে, যা দর্শকদৃষ্টিকে স্থিতিশীল করে এবং তার চেনা পরিবেশের সাথে এক ধরনের আত্মিক সংযোগ ঘটায়।

- বিষয়বস্তুকে স্বাধীন ও ছন্দ-এর গতিশীলতায় উপস্থাপন করা হয়েছে। ফলে তাতে তৈরি হয়েছে শিশুর স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ততা। এর মাধ্যমে দর্শক নগর জীবনের কলহ-বিষন্নতার আবহ থেকে মুক্ত হয়ে এক ধরনের শান্ত ও স্থিরতার অনুভূতিতে উদ্বুদ্ধ হয়।

- দ্বিমাত্রিক সারফেসে রেখার ছোটো ছোটো আঁচড়ের মাধ্যমে টুকরো টুকরো মেঘ বোঝানো হয়েছে, যেখানে রেখার প্রতিটি আঁচড় বেশ জোরালোভাবে প্রতীয়মান। এর ফলে চিত্রপটে হোয়াইট স্পেস ও পজিটিভ স্পেস পৃথকীকরণ হয়েছে সুচারুভাবে। এক্ষেত্রে মাইক্রো-হোয়াইট স্পেসের (micro-white space)[৮] আধিক্য পুরো চিত্র জুড়েই বিদ্যমান। এর ফলে দর্শক কালো ছোটো রেখা (পজিটিভ স্পেস)-তেই বেশি আকৃষ্ট হয়ে বিষয়বস্তুকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অবলোকন করতে সাহায্য করে।

চিত্র ৩

এটি শিল্পী মাহবুবুর রহমান রচিত। এখানে উপস্থাপিত দৃশ্যগত উপাদানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রতীয়মান হয়–

- বিষয়বস্তু এখানে কনট্যুর রেখা (contour line)[৯]-তে উপস্থাপিত, যার নিখুঁত স্পষ্টতায় দু'টি মানবদেহ, কাপড়ের ভাঁজ, মেঝের নকশা ইত্যাদি ফুটে উঠেছে। ফলে দর্শক তার পরিচিত পরিবেশ-পরিস্থিতির সাথে নিজস্ব পরিমণ্ডলের সামঞ্জস্য খুঁজে পায়।

- চিত্রে টেক্সচার তৈরি করা হয়েছে হ্যাচিং রেখা ও রেখার ঘনত্ব তৈরির মাধ্যমে। এর ফলে চিত্রে বর্ণনামূলক ও কৌতুকধর্মী এক ধরনের আবহ সৃষ্টি হয়েছে, যা বিষয়বস্তুর মাঝে গল্প খোঁজার জন্য দর্শক মনকে আগ্রহী করে তোলে।

- চিত্রে মানবদেহ ও তার পরিবেশের আবহ প্রাকৃতিক আকৃতি (organic shape)-তে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তবে তা নিখুঁতভাবে নয়, বরং কিছুটা বিক্ষিপ্ত অথচ শক্তিশালী রেখার ঢঙে উপস্থাপিত হয়েছে, যা দর্শক মনকে অস্থির ও অশান্ত মানসিক অবস্থার অনুভূতি জাগায়।

- মূল বিষয়বস্তু বিন্যস্ত হয়েছে 'ত্রিকোণ বিন্যাস' (triangle compostition)-এ, যা স্থিতিশীল বিন্যাসের ধারণা দেয়। এক্ষেত্রে মূল বিষয়বস্তু এবং ব্যাকগ্রাউন্ডের বৈপরীত্য খুব স্পষ্ট। ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে তুলনামূলক ফাঁকা, কিছু টেক্সট ও সমতল রেখার সাহায্যে বিষয়বস্তুর ইঙ্গিত রয়েছে মাত্র। আবার, উপস্থাপিত মেঝের টেক্সচার ও ঝোলানো ছবির মাঝে ম্যাক্রো-হোয়াইট স্পেসের মাধ্যমে পরিপ্রেক্ষিত তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে একটি ঘরের পরিবেশের আভাস পাওয়া যায়।

- চিত্রে পজিটিভ স্পেস এবং হোয়াইট স্পেস এখানে খুব স্পষ্টভাবে বিভক্ত হয়েছে, যেখানে রেখার প্রাঞ্জল উপস্থিতি পজিটিভ স্পেস বেশিমাত্রায় আধিক্য বিস্তার করেছে। হোয়াইট স্পেসে টেক্সচের ব্যবহার সম্ভবত ফেলে আসা দিনের স্মৃতিচারণের ইঙ্গিত বহন করে। এক্ষেত্রে ব্যাকগ্রাউন্ডে উপস্থাপিত টেক্সচট সামনের মূল বিষয়বস্তুর সাথে দূরত্ব স্থাপন করে অতীত ও বর্তমানের সাথে এক ধরনের মেলবন্ধন তৈরি করে।

- এখানে উপস্থাপিত টেক্সচট-এর মসৃণ আভাস 'reclining venus' সাধারণত পাশ্চাত্যের ঐতিহ্যবাহী চিত্রকলাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। কারণ ভেনাস মূলত কাম ও সুন্দরের দেবী। কিন্তু এক্ষেত্রে এই ভেনাস যেন কিছুটা ব্যাঙ্গাত্মক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এই ভেনাসের মাথায় চুল নেই, তবুও বিপরীত দিকে ব্যবহৃত হয়েছে 'flower in her hair orchid'-কথাটি, যা সামাজিক প্রতীকী অর্থে নারীর সৌন্দর্যের উপস্থাপনকে এক ধরনের বিদ্রুপ হিসেবে চিহ্নিত করে।

- মূল বিষয়বস্তু ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পী এডওয়ার্ড মানেট (Edouard Manet)-এর 'অলিম্পিয়া' চিত্রের কম্পোজিশনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তবে সামাজিক প্রেক্ষাপট ভিন্ন। আলোচ্য চিত্রের শায়িত ফিগারটিকে সুস্থতা ও শুভ্রতার প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়েছে। অপরদিকে পেছনের আসনে থাকা ফিগারটি সার্বিক দৃশ্যপটকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক টানাপোড়েনের প্রতীক করে তুলেছে।

৭.২ সমসাময়িক ছাপচিত্র বিশেষজ্ঞদের রচিত ইলেকট্রোবাইট এচিংকৃত ছাপচিত্র

চিত্র ৪

উল্লিখিত চিত্রটি শিল্পী মনিরুল ইসলাম রহমান রচিত। এখানে উপস্থাপিত দৃশ্যগত উপাদানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রতীয়মান হয়–

- চিত্রে রেখা ব্যবহারের ধরন একেবারেই মুক্ত এবং অনেকটা যেন পরীক্ষামূলক। বলা যায়, বিষয়বস্তু এখানে অ-সরল বক্র (non simple curve)[১০] রেখা ও তির্যক (diagonal) রেখায় উপস্থাপিত। কালো পাতলা রেখা কখনও বাঁকা ও এলোমেলো; যা চিত্রে এক ধরনের অস্থিতিশীল আবহ সৃষ্টি করেছে। লাল রঙের ছোটো ছোটো রেখা ছবিতে একটি আলাদা দৃশ্যগত ফোকাস যুক্ত করেছে। রেখাগুলো এখানে নির্দিষ্ট পরিচিত কোনো ফর্ম তৈরি করেনি, এর পরিবর্তে ছবির মধ্যে অদৃশ্য এক ধরনের গতিশীলতা ও দিকনির্দেশনা তৈরি করছে। এর মাধ্যমে দর্শকের বিভিন্ন মুহূর্তের বিক্ষিপ্ত মানসিক অবস্থা জাগ্রত হয়, ফলে তারা সমাজের বিভিন্ন সময়ের সংগতি-অসংগতিকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়।

- চিত্রের আকৃতিগুলো নির্দিষ্ট নয়, বরং বিমূর্ত ও ভাঙাচোরা রেখায় উদ্ভাসিত। হলুদ ও বাদামি রঙের আকৃতিগুলো এক্ষেত্রে আংশিকভাবে জ্যামিতিক মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে সেগুলো অর্গানিক এবং মুক্ত ভঙ্গিতে আঁকা। আকৃতিগুলো এখানে কাগজের সাদা অংশের সাথে মিলে এক ধরনের ভারসাম্য ও ফাঁকা স্পেস তৈরি করেছে। এতে দর্শক নিজেকে হালকা ও নিশ্বাসের একটি ক্ষেত্র হিসেবে তার অবস্থান তৈরি করে নেয়। চিত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয়– তির্যক রেখা দ্বারা অ্যামবোস (amboss)[১১] করা একটি ত্রিকোণ আকৃতি, যা দেখতে ইংরেজি 'A' বর্ণের মতো। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন প্রাথমিক জ্ঞানের যাত্রা শুরু বোঝায়, তেমনি অন্যদিকে স্থিতিশীল পরিবেশ থেকে বের হয়ে নতুন কোনো শিল্প শৈলীর গতিপথ খোঁজার চেষ্টারও ইঙ্গিত বহন করে।

- চিত্রে হলুদ, বাদামি ও লাল– এই তিনটি প্রধান রং ব্যবহৃত হয়েছে। হলুদ রং চিত্রটিকে প্রাণবন্ত ও উদ্দীপ্ত করেছে; বাদামি রং মাটির মতো স্থিরতা এনেছে; নীল রং একাকীত্ব এবং ছোটো ছোটো লাল রেখা ছবিতে উত্তেজনা ও দৃশ্যগত কনট্রাস্ট (contrast) সৃষ্টি করেছে। এক্ষেত্রে ফাঁকা ব্যাকগ্রাউন্ড রংগুলোকে আরও স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছে।

- চিত্রে স্পেসের ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে বড়ো অংশ ফাঁকা রাখা হয়েছে, যা হোয়াইট স্পেস হিসেবে বিরাজমান। এই ফাঁকা স্পেস চিত্রটিকে খোলা, হালকা ও শান্ত অনুভূতি প্রদান করেছে। চিত্রে বলিষ্ঠ রেখায় উপস্থাপিত বিভিন্ন উপাদান ছোটো ছোটো স্পেস-এর মাধ্যমে পারস্পরিক এক বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে, অন্যদিকে একই কারণে হোয়াইট স্পেসের সাথে এই উপাদানগুলো একটি বড়ো স্পেসের মাধ্যমে (wide space) পরস্পরের সাথে দূরত্ব তৈরি করেছে। আবার এর ফলে পুরো চিত্রে এক ধরনের ভারসাম্যও সৃষ্টি হয়েছে। এই চিত্র দ্বারা দর্শকের মনে অবস্থানগত ধারণার সাথে মনস্তাত্ত্বিক উপলব্ধির একটি আধ্যাত্মিক সংযোগ স্থাপন করে।

- চিত্রে স্টিপলিং (stippling)[12] রেখার মাধ্যমে টেক্সচার তৈরি করা হয়েছে। এখানে প্রতিটি বিন্দু নির্দিষ্টভাবে উদ্ভাসিত, যা রংবিহীন হোয়াইট স্পেসে অ্যামবোস-এর সাহায্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এর ফলে দর্শক মনে সংবেদন (sensation)-এর অনুভূতি তৈরি করে এক ধরনের মায়া (illusion) সৃষ্টি করে। অপরদিকে এর দ্বারা পুরোনো ক্ষত-এর অনুভুতিও জাগ্রত করে।

চিত্র ৫

এই চিত্রটি শিল্পী শহিদ কবির রচিত। এখানে উপস্থাপিত দৃশ্যগত উপাদানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রতীয়মান হয়–

- বিষয়বস্তু বিভিন্ন ধরনের বক্র রেখা (curve line) দ্বারা আবৃত। এখানে জটিল, অমসৃণ ও গতিশীল রেখাগুচ্ছের সাহায্যে লালনের একটি প্রোফাইল মুখাবয়ব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এর মাধ্যমে আধ্যাত্মিকতা, কোমলতা ও কঠিন ধ্যান প্রকাশিত হয়েছে। মূলত মুক্ত বক্র রেখা (open curve line)[১৩] ও অ-সরল মুক্ত বক্ররেখার নিখুঁত সমন্বয়ে অবয়বের ভেতরের অংশগুলো আবৃত, যা দ্বারা মুখ-চুল-কাপড়ের ভাঁজ বোঝানো হয়েছে। এ ধরনের ঘুর্ণায়মান রেখা সাধারণত দর্শক মনে বিষন্নতা, আনন্দ, বিভ্রান্তি বা স্বপ্নের অনুভূতি সৃষ্টি করে। আবার রেখাগুলো অনেকটা যেন গ্রামীণ নকশি কাঁথার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেখানে এক সুতার সাথে অন্য সুতার ফোড়গুলো (stitch) যুক্ত হয়ে অভিন্ন জাত-ধর্ম-বর্ণ-এর ইঙ্গিত দেয়। অর্থাৎ মানবতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যা বাউল দর্শনের মূল কথা। অন্যদিকে রেখাগুলো কোনো নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ নয়, বরং নিজেই নিজের নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ফলে দর্শক দর্শনের সাথে সাথে আধ্যাত্মিকতার একটি আমেজেও সম্পৃক্ত হয়।

- চিত্রের পটভূমিতে মূলত হোয়াইট স্পেসেরই আধিক্য রয়েছে, যা দর্শক দৃষ্টিকে চিত্রের মাঝে অবাধ বিচরণ করতে সাহায্য করে। এর ফলে এক ধরনের চিন্তা-ভাবনার অবকাশ পাওয়া যায়। অন্যদিকে স্পেস ও রেখার বিশৃঙ্খলার মাঝেও শান্তি ও স্থিরতার অনুভূতি তৈরি করে।

- চিত্রের প্রোফাইল মুখাবয়ব কম্পোজিশন-এর ক্ষেত্রে সাধারণত সম্মুখে স্পেস ছেড়ে দিয়ে উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু আলোচ্য চিত্রটি এর ব্যতিক্রম। এখানে মুখাবয়বের সামনের তুলনায় পেছনের অংশ অনেক বেশি দেখানো হয়েছে, যা লালন দর্শনের ভাব-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। লালন এখানে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় চিত্রায়িত হয়েছে, যার সম্মুখ অংশ জমিনের স্বল্প পরিসরে এবং মুখের বাকি অংশ মুক্ত পরিসরে দৃশ্যায়িত হয়েছে। এর মাধ্যমে লালনের কঠিন সাধনা ও তাঁর পেছনে ফেলে আসা দীর্ঘ পার্থিব জীবনের বড় একটি অংশের ইঙ্গিত বহন করে।

চিত্র ৬

চিত্রটি শিল্পী আলমগীর হক রচিত। এখানে উপস্থাপিত দৃশ্যগত উপাদানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রতীয়মান হয়–

- বিষয়বস্তু বিভিন্ন মাপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনুভূমিক (horizontal) ও উল্লম্ব (verticle) রেখা দ্বারা উপস্থাপিত, যা কাঠের দাগ বা প্রাকৃতিক গঠনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। রেখাগুলোর

সাহায্যে চিত্রে এক ধরনের গভীরতা ও নানা স্তর (layer) তৈরি হয়েছে। এর মাধ্যমে দর্শক মনে ওপর থেকে ফাঁকা রুক্ষ জমি দেখার আমেজ তৈরি করে।

- সম্পূর্ণ চিত্রটিতে বিভিন্ন মাপের চতুর্ভুজ (square) আকৃতি-র সুবিন্যাস পরিলক্ষিত হয়। এর সাহায্যে মূলত ব্যাকগ্রাউন্ড ও ফোরগ্রাউন্ডকে পৃথক করা হয়েছে। এছাড়া রেখার বিভিন্ন ঘনত্ব-এর দ্বারা মাঝের চারকোনা আকৃতিগুলোকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এই ধরনের আকৃতির মাধ্যমে এক ধরনের বেষ্টনী তৈরি করা হয়েছে, যা দর্শক মনে নিরাপত্তা ও সীমানার ধারণার জন্ম দেয়।

- চিত্রের ঠিক মাঝখানে দুই স্তরের ওপর হলুদ রঙের একটি চারকোণা আকৃতির স্তর লক্ষণীয়। এটি পুরো চিত্র জুড়ে এমন ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে যে, চারপাশে থাকা অন্যান্য উপাদানকে ছাপিয়ে এককভাবে সম্পূর্ণ চিত্রের ভারসাম্য রক্ষা করেছে। হলুদ রং সাধারণত আলো, শক্তি ও আশাবাদ প্রকাশ করে, যা এখানে রুক্ষ জমির মাঝে যেন এক টুকরো আলো। বলা যেতে পারে– এটি রঙের সংমিশ্রণে আলো-ছায়ার নাটকীয়তা, যা দর্শক মনকে উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত ও আশাবাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অপরদিকে হলুদের মধ্যে সাদা তিনটি তির্যক রেখা একই সঙ্গে অস্তিত্ব সংকটের অনুভূতি জাগায়।

- বিভিন্ন চারকোনা আকৃতির মাঝে স্টিপলিং রেখার মাধ্যমে টেক্সচার তৈরি করা হয়েছে। তবে, ওপরের দুটি আকৃতিতে এর ঘনত্ব বেশি এবং মাঝে ও নিচের আকৃতিতে তুলনামূলক ঘনত্ব কম। ফলে দুই ক্ষেত্রে দুই ধরনের টেক্সচার যেমন তৈরি হয়েছে, তেমনি রঙেরও ভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। এর মাধ্যমে দর্শকের কাছে একদিকে যেমন জমির রুক্ষতার বৈচিত্র্য বিমূর্তভাবে প্রকাশিত হয়, তেমনি অন্যদিকে রুক্ষ-নিরব-অনাবাদি জমির রহস্যও উন্মোচিত হয়।

৭.৩. অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের রচিত ইলেকট্রোবাইট এচিংকৃত ছাপচিত্র

চিত্র ৭

চিত্রটি শিল্পী আবু আল নাঈম রচিত। এখানে উপস্থাপিত দৃশ্যগত উপাদানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রতীয়মান হয়–

- বিষয়বস্তুর ড্রইং 'স্ক্রিবলিং' ও কনট্যুর রেখায় উপস্থাপন করা হয়েছে। সূক্ষ্ম ও ঘন রেখার মাধ্যমে এখানে একটি মানুষের মুখাবয়ব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যা আবেগঘন ও অভিব্যক্তিপূর্ণ (expressive) ভঙ্গিতে উপস্থাপিত। ব্যবহৃত রেখাগুলো সরল বা নিয়ন্ত্রিত নয়, বরং এলোমেলো ও ভাঙাচোরা। ফলে চিত্রে এক ধরনের গতিশীলতা প্রকাশিত হয়েছে, যা মানসিক অস্থিরতা জন্ম দেয়। চোখের চারপাশ, ভাঁজ এবং ঠোঁটের

অংশ এবং সম্পূর্ণ মুখাবয়বের বহিঃরেখা তুলনামূলক মোটা, যা অন্যান্য রেখা ছাপিয়ে মূল বিষয়বস্তুকে লক্ষণীয় করেছে। এর মাধ্যমে মুখমণ্ডলে বিশেষ এক আবেগ প্রতিফলিত হয়েছে। এক্ষেত্রে মুখাবয়ব দর্শকের দিকে তাকানো অবস্থায় উপস্থাপিত হয়েছে। ফলে চিত্রের মানুষটি দর্শকের সাথে এক ধরনের মিথস্ক্রিয়া (interaction)-য় সম্পৃক্ত হয়েছে, যার মাধ্যমে চিত্রের মানব অবয়বের অনুভূতির সাথে দর্শকের অনুভূতির এক গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়।

- চিত্রের আকৃতি বাস্তবধর্মী নয়, বরং বিমূর্ত এবং ডিসটর্টেড (distorted)-এর ছাপ বহন করছে। চোখ, নাক, ঠোঁট ও গাল– দুমড়ানো, বাঁকানো এবং অনিয়মিত আকৃতি দিয়ে গঠিত। এর ফলে মুখাবয়বটি অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, দুঃখ ও অস্থিরতার প্রতীক হয়ে উঠেছে। এখানে জ্যামিতিক আকৃতির পরিবর্তে প্রাকৃতিক আকৃতি ব্যবহৃত হয়েছে, যা চিত্রটিকে আরও মানবিক ও আবেগঘন করে তুলেছে। এর মাধ্যমে দর্শক মনে তার নিজস্ব মনস্তাত্ত্বিক জগতের নানা টানাপোড়েন, অস্থিরতা, আবেগ বা বিশৃঙ্খলার সাথে একাত্ম হওয়ার অনুভূতি তৈরি করে।

- চিত্রটিতে পজিটিভ ও হোয়াইট স্পেসের মধ্যে মূল পার্থক্য তৈরি করেছে রং। ব্যাকগ্রাউন্ডের লাল রং ও টেক্সচার ফোরগ্রাউন্ডের মুখের সাথে একাকার হয়ে গভীরতা ও নাটকীয়তা সৃষ্টি করেছে। ফলে চিত্রে কোনো হোয়াইট বা ফাঁকা স্পেস তেমনভাবে পরিলক্ষিত হয় না, বরং প্রতিটি অংশে ঘনত্ব অনুভূত হয়। এই চাপা ও ভরাট স্পেস দর্শকের মনে এক ধরনের চাপা টেনশন তৈরি করে।

চিত্র ৮

চিত্রটি শিল্পী ঋতুরূপা তালুকদার রচিত। এখানে উপস্থাপিত দৃশ্যগত উপাদানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রতীয়মান হয়–

- বিষয়বস্তুতে ব্যবহৃত রেখা বলিষ্ঠ (bold), স্পষ্ট এবং কিছুটা তীক্ষ্ম। ছাগল, মানুষের মুখ, প্রতীকচিহ্ন– সবকিছুই কনট্যুর, ক্রস কনট্যুর এবং ব্লেন্ডিং (blending)[১৪] রেখার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। রেখা কখনও কাঠামোগত (structural), আবার কখও আলো-ছায়া বা টেক্সচার তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। বিশেষ করে মুখমণ্ডলের গোঁফ, চুল ও ছাগলের দেহে সূক্ষ্ম রেখা টেক্সচারের বৈচিত্র্য এনেছে। এর মাধ্যমে দর্শকের কাছে এক ধরনের লোকশিল্প ও আধ্যাত্মিকতার প্রতিফলন ঘটায়।

- চিত্রের আকৃতি কার্টুনধর্মী, যেখানে বিভিন্ন বিষয়বস্তুকে সহজ, সরল প্রাথমিক ফর্মে উপস্থাপন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বাস্তবিক ত্রিমাত্রিকতা বা পরিপ্রেক্ষিতের সাদৃশ্য নেই, বরং তা কিছুটা অতিরঞ্জিত ও প্রতীকী। চিত্রে ব্যবহৃত গোল চোখ, মোটা গোঁফ,

শক্তিশালী কনট্যুর রেখায় উপস্থাপন করা হয়েছে। উপরের দিকে একটি হাত ও পা-র মোটিফ রয়েছে, যা ধর্মীয় বা রিচুয়ালিস্টিক প্রতীককে চিহ্নায়িত করে। ব্যাকগ্রাউন্ডে স্থাপিত জ্যামিতিক ছক (চৌকো ঘরে বিন্যাস) আধ্যাত্মিক বা মন্ত্রচিহ্নের ইঙ্গিত দেয়। এভাবে বিভিন্ন ধরনের আকৃতি একত্রে একটি প্রতীকী চিহ্ন তৈরি করেছে। এর মাধ্যমে দর্শক চিত্রে সরল বর্ণনার বাইরে গিয়ে বিভিন্ন প্রতীক ও এর অর্থ খোঁজার প্রয়াস পায়।

- চিত্রে প্রতিটি বিষয়বস্তুর পৃথকভাবে বিন্যাস লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ, ব্যবহৃত ছাগল, মুখ, হাত, প্রতীকচিহ্ন প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা বেসলাইন (baseline grid)[১৫] গ্রিডে স্থাপিত। ফলে এগুলো আলাদাভাবে দৃষ্টিগ্রাহ্য হলেও একসাথে প্রতীকী কম্পোজিশন তৈরি করেছে। ম্যাক্রো-হোয়াইট স্পেসের সাহায্যে প্রতিটি বিষয়বস্তুর মাঝে ভারসাম্য আনা হয়েছে। এর মাধ্যমে দর্শকের মনোযোগ আলাদাভাবে এক একটি মোটিফের ওপর কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

চিত্র ৯

চিত্রটি শিল্পী আনিকা হক সন্ধি রচিত। এখানে উপস্থাপিত দৃশ্যগত উপাদানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রতীয়মান হয়–

- বিষয়বস্তু মোটা ও গাঢ় বহিঃরেখায় উপস্থাপিত। তবে এক্ষেত্রে হ্যাচিং রেখার সাহায্যে আলো-ছায়া তৈরির মাধ্যমে বিষয়বস্তুর একটি ত্রিমাত্রিক কাঠামো তৈরির চেষ্টা করা হয়েছে, যা দৃশ্যায়িত প্রাণীর আকার ও গুরুত্বকে বাড়িয়ে তুলেছে। অন্যদিকে ঘাস, ফুল ও ব্যাকগ্রাউন্ডে হ্যাচিং ব্যবহার করে প্রকৃতির স্বাভাবিক গতি ও স্বতঃস্ফূর্ততা প্রকাশ করা হয়েছে। এই রেখা-ই মূলত ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে বিষয়বস্তুকে আলাদা করেছে। এর মাধ্যমে উপস্থাপিত বিষয়বস্তুর চারপাশের আবহ ও মূল চরিত্রের সরলীকৃত ভঙ্গিমা দর্শকের কাছে অধিক সহজবোধ্য করে তোলে।

- চিত্রে উপস্থাপিত বিষয়বস্তুর আকৃতি মূলত অর্গানিক এবং এর বিভিন্ন অংশ বাস্তবসম্মতভাবে সমানুপাতিক। কারণ ব্যবহৃত প্রাণীটির শরীর ও মুখ প্রায় স্বাভাবিক আকৃতিতে উপস্থাপিত হলেও কিছুটা সরলীকৃত, যাতে অনেকটা কার্টুনধর্মী ও সহজবোধ্য মনে হয়। ফুলগুলোর আকৃতিও সরল রেখায় গঠিত, যা চিত্রে এক ধরনের অলঙ্করণমূলক ভাব তৈরি হয়েছে। পুরো চিত্রের আকৃতি প্রকৃতির সহজ সৌন্দর্য ও প্রাণীর দৈনন্দিন অস্তিত্বকে প্রতিফলিত করেছে। এটি শুধু প্রতিকৃতি হিসেবে নয়, বরং দর্শক মনে তার চেনা গ্রামীণ জীবনের প্রতিফলন ঘটায়।

- স্পেস ব্যবহারে বিষয়বস্তু ও ব্যাকগ্রাউন্ডের মধ্যে ভারসাম্য রাখা হয়েছে। এখানে উপস্থাপিত প্রাণীটিকে বড় আকারে দেখানো হয়েছে, ফলে সেটি-ই দর্শকের মনোযোগ

আকর্ষণ করছে। ব্যাকগ্রাউন্ডে ঘাস ও প্রাকৃতিক পরিবেশকে পাতলা রেখা ও হালকা আলো-ছায়া তৈরির মাধ্যমে মূল বিষয়বস্তুকে আরও স্পষ্ট ও প্রধান করে তুলেছে। একইসঙ্গে ফুলগুলো সামনে উপস্থাপন করে কম্পোজিশনের ভিজ্যুয়াল ভারসাম্য রক্ষা করা হয়েছে। হোয়াইট স্পেসে হালকা ও গাঢ় টোন (colour value) ব্যবহারের ফলে ছবিতে গভীরতা ও ভরাট ভাব এসেছে। এর মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাসে প্রাণীটির ভীতির ভাবটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সার্বিক পর্যালোচনা

সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ থেকে বলা যায়– নাইট্রিক অ্যাসিডে ক্ষয়কৃত ঐতিহ্যবাহী এচিং-এর তুলনায় ইলেকট্রোবাইটের এচিং-এর ধরন অধিকতর গভীর ও তীক্ষ্মতর হওয়ায় আলোচিত প্রতিটি চিত্রে রেখার বৈচিত্র্য দ্বারা কাঙ্ক্ষিত বিষয়বস্তুর খুঁটিনাটি অনেক বেশি সূক্ষ্ম এবং স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি উপস্থাপিত টেক্সচার ও টোনাল ভ্যালু যা দৃশ্যায়িত হয়েছে, তা লক্ষণীয় মাত্রায় সংবেদনশীল। ফলে চিত্রগুলোতে সৃজনকৃত প্রতিটি ফর্ম যেমন: মানবের পূর্ণাঙ্গ অবয়ব, প্রতিকৃতি, প্রাকৃতিক পরিবেশ, আধ্যাত্মিক ভাবনা কিংবা বিমূর্ততার রহস্য– সবই তার নিজস্ব ছন্দে মূর্ত হয়ে উঠেছে, যেন প্রতিটি রেখা ও গড়ন নিজেই এক অনুচ্চ ভাষায় কথা বলে। বলা যায়– শিল্পী তাঁর ভাব প্রকাশের জন্য চিত্রে যে রেখা যেভাবে প্রকাশ করতে চান, ঠিক সেভাবেই ইলেকট্রোবাইট এচিং পদ্ধতিতে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছে, নাইট্রিক অ্যাসিডে ক্ষয়কৃত এচিং-এর সীমাবদ্ধতার কারণে যা পুরোপুরি সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে তিনটি ব্যতীত অন্যান্য চিত্রে কোনো রং ব্যবহৃত না হলেও প্রতিটি চিত্র রেখা ও টেক্সচারের নিপুণ ব্যবহারে এমন বাঙময় রূপ ধারণ করেছে যে, তা মানব হৃদয়ের গভীর অনুভূতিকে নিঃশব্দে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। উল্লেখ্য যে, নাইট্রিক অ্যাসিডে ক্ষয়কৃত এচিং-এ তৈরিকৃত ছাপচিত্রে রঙের ব্যবহার তেমন একটা দেখা যায় না। কারণ, ছাপচিত্রে বিভিন্ন রঙের ক্ষেত্রে আলাদা ধাতুপাতের ব্লক তৈরি করতে হয়, যা উক্ত এচিং পদ্ধতিতে কষ্টসাধ্য ও ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু ইলেকট্রোবাইট এচিং পদ্ধতিতে ধাতুপাতের ব্লক তৈরি করা সহজ ও নিরাপদ। ফলে এক্ষেত্রে বৈচিত্র্যময় রঙের ব্যবহার সম্ভব। অর্থাৎ চিত্রকলার বিভিন্ন মাধ্যমে যে শৈল্পিক আবেদন মানব মনকে গভীরভাবে নাড়া দিতে সক্ষম, সেই আবেদন মাধ্যমের ভিন্নতায় ম্লান হয় না। ইলেকট্রোবাইট এচিং-এ উপস্থাপিত চিত্রের ক্ষেত্রেও সেই একই অনুভূতির অভিব্যক্তিপূর্ণ প্রকাশ সম্ভব, যা দর্শকের হৃদয়ে নিঃশব্দে আলোড়ন তোলে। এক্ষেত্রে বলা যায়– বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য (unity of diversity), যার মাধ্যমে ছাপচিত্র নির্মাণে কৌশলগত জ্ঞানের ঠিক প্রয়োগ সম্ভব হয়। অন্যভাবে, ইলেকট্রোবাইট এচিং এক শৈল্পিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চিরন্তন শিল্পসৃষ্টির ধারাকে সমৃদ্ধ করতে পুরোপুরি সক্ষম।

চিত্র ১: শিল্পী হাশেম খান রচিত ইলেকট্রোবাইট এচিং

চিত্র ২: শিল্পী রফিকুন নবী রচিত ইলেকট্রোবাইট এচিং

চিত্র ৩: শিল্পী মাহবুবুর রহমান রচিত ইলেকট্রোবাইট এচিং

চিত্র ৪: শিল্পী মনিরুল ইসলাম রচিত ইলেকট্রোবাইট এচিং

চিত্র ৫: শিল্পী শহিদ করিব রচিত ইলেকট্রোবাইট এচিং

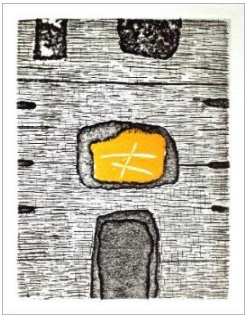

চিত্র ৬: শিল্পী আলমগীর হক রচিত ইলেকট্রোবাইট এচিং

চিত্র ৭: শিল্পী আবু আল নাঈম রচিত ইলেকট্রোবাইট এচিং

চিত্র ৮: শিল্পী ঋতুরূপা তালুকদার রচিত ইলেকট্রোবাইট এচিং

চিত্র ৯: শিল্পী আনিকা হক সন্ধি রচিত ইলেকট্রোবাইট এচিং

উপসংহার

আধুনিক ছাপচিত্র শিল্পে ধাতুপাতে ইলেকট্রোবাইট এচিং পদ্ধতি এক গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর প্রযুক্তিগত ও শৈল্পিক সংযোজন। এই পদ্ধতির মাধ্যমে যেমন সূক্ষ্ম রেখার গভীরতা ও বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তোলা যায়, তেমনি ধাতুপাতে স্থায়িত্ব ও দৃশ্যগত বৈশিষ্ট্যের নান্দনিকতা সৃষ্টি করাও সম্ভব। ব্যবহারিক দিক থেকে এটি তুলনামূলক নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব একটি মাধ্যম, যেখানে শৈল্পিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে ইলেকট্রোবাইট এচিং শিল্পীর মনন ও প্রযুক্তির মেলবন্ধন ঘটিয়ে শিল্পচর্চায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করা যায়। বাংলাদেশে এই পদ্ধতি চর্চার উত্থান অ্যাকাডেমিক চর্চার সাথে সাথে ব্যক্তিগত, অ-ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক ছাপচিত্র স্টুডিওর ক্ষেত্রে শিল্পী ও শিক্ষার্থীদের আরও সমৃদ্ধ করে তুলবে। এছাড়া ইলেকট্রোবাইট এচিং পদ্ধতিকৃত ছাপচিত্র শিল্পের সম্ভারকে করবে আরও প্রসারিত, পাশাপাশি নান্দনিকতায় হবে পূর্ণ ও শৈল্পিক উৎকর্ষে ভাস্বর। শিল্পের এই নবযাত্রা সমাদৃত হবে আরও স্বচ্ছন্দ, সাবলীল ও হৃদয়গ্রাহী অভিব্যক্তির মাধ্যমে।

অন্তত্য-টীকা

[১] ফেব্রিয়ানো রোজারপিনা (fabriano rojerpina): এক ধরনের উচ্চমানের ইতালীয় কাগজ, যা মূলত ছাপচিত্র চিত্রের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি Fabriano ব্র্যান্ডের একটি জনপ্রিয় পণ্য, যা শিল্পীদের মধ্যে বিশেষভাবে সমাদৃত।

[২] স্ক্রিবলিং (scribbling) রেখা: এলোমেলো, অগোছালো এবং উদ্দেশ্যহীনভাবে রেখা। সাধারণত শিশুদের আঁকাআঁকিতে এই ধরনের রেখা দেখা যায়।

[৩] অবিচ্ছিন্ন রেখা (continious line): যে সকল রেখা আঁকার সময়ে হাত না তুলে ড্রয়িং সম্পূর্ণ করা হয়।

[৪] পজিটিভ স্পেস (positive space): এটি সাধারণত কোনো চিত্রে মূল ফোকাস হিসেবে বিবেচিত যেকোনো কিছুর আকারকে বোঝায়। এটি দ্বিমাত্রিক বা ত্রিমাত্রিক যে কোনোভাবে অনুভূত হতে পারে।

[৫] নেগেটিভ/হোয়াইট স্পেস (negative / white space): এই স্পেস বলতে প্রতিটি গ্রাফিক উপাদানের মধ্যবর্তী স্থানকে বোঝায়। সাদা স্পেস নাম হলেও এটি সাদা হতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। এটি সম্পূর্ণরূপে ফাঁকা বা সাদা হতে পারে, আবার ক্ষেত্র বিশেষে যেকোনো রং, টেক্সচার বা প্যাটার্ন, এমনকি ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজও থাকতে পারে। সহজ কথা হলো– Negative বা White Space-এর বিপরীতে চিত্রে মূল বিষয়বস্তু পরিস্কারভাবে দৃশ্যায়িত হয়।

[৬] ক্রস হ্যাচিং (cross-hatching): এই ধরনের রেখা মূলত পাতলা, সমান্তরাল সূক্ষ্ম রেখার সমষ্টি; যা বিষয়বস্তুর শেড, টোন বা টেক্সচার তৈরিতে সাহায্য করে। এগুলি সাধারণত স্কেচিংয়ে ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে Hatching এর সঙ্গে cross hatching Line-কে যুক্ত করে বিষয়বস্তুর ডার্ক শেড তৈরি করা হয়।

[৭] বহিঃরেখা (outline): কোনো আকৃতির সীমারেখা, যা মূল আকৃতিকে সংজ্ঞায়িত করে। এটি ড্রয়িং-এর প্রাথমিক ধাপ, যার সাহায্যে একটি অবজেক্ট বা চরিত্রের রূপরেখা তৈরি করা হয়।

[৮] ম্যাক্রো হোয়াইট স্পেস (macro white space): এই ধরনের স্পেস হলো চিত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদানের আশেপাশের তুলনামূলক বড় স্থান।

[৯] কনট্যুর লাইন (contour line): বিষয়বস্তুর আকৃতির ওপর ভিত্তি করে আঁকা হয়। outline-এর সঙ্গে এর পার্থক্য হলো– outline কানো বস্তুর শুধু বাইরের আকৃতিকে দৃশ্যমান করার জন্য ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে contour বিষয়বস্তুর ক্যারেকটার অনুযায়ী পুরো রূপরেখা দৃশ্যমান করে রেখার মাধ্যমে। এক্ষেত্রে cross contour line-ও ব্যবহৃত হতে পারে।

[১০] অ-সরল বক্র (non simple curve): এই ধরনের বক্র রেখাগুলো গতিপথ (direction) পরিবর্তন করার সময় পরস্পরকে ছেদ করে। এগুলোও Open বা Closed উভয় ধরনের হতে পারে।

[১১] অ্যামবোস (amboss): এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে কোনো চিত্র, লেখা বা নকশাকে উঁচু করে তোলা হয়, যাতে তা স্পর্শ করলে বা দেখলে আলাদা করে বোঝা যায়। এটি সাধারণত ডিজাইন, প্রিন্টিং, বা গ্রাফিক্সে ব্যবহৃত হয়।

[১২] স্টিপলিং (stippling): এক্ষেত্রে অসংখ্য ছোট ছোট বিন্দু বা ডট ব্যবহার করে একটি চিত্র বা রেখা তৈরি করা হয়।

[১৩] ওপেন কার্ভ লাইন (open curve line): এই ধরনের বক্র রেখার শেষ দুই বিন্দু খোলা থাকে।

[১৪] ব্লেন্ডিং লাইন (blending line): যার মাধ্যমে দুটি রং, শেড বা আকৃতি মসৃণভাবে একে অপরের সঙ্গে মিশে যায়। এটি চিত্রকলায়, বিশেষ করে ড্রয়িং, পেইন্টিং এবং ডিজিটাল আর্টে একটি গুরুত্বপূর্ণ টেকনিক।

[১৫] বেসলাইন গ্রিড (baseline grid): প্রতিটি অক্ষর বা লাইনের নিচের যে কাল্পনিক রেখা ধরে লেখা স্থাপিত হয়, তাকে বেসলাইন গ্রিড বলে। চিত্রের ক্ষেত্রে কোনো বিষয়বস্তুও এই গ্রিড অনুযায়ী উপস্থাপিত হতে পারে।

সহায়কপঞ্জি

আকরাম উজ্জামান, মুহাম্মদ। (২০২০)। *গবেষণা পদ্ধতি* ৩য় সংস্করণ, প্রত্যয় পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

রশীদ আমিন (২০০৭)। 'ছাপচিত্র'। *চারু ও কারুকলা* [সম্পা. লালা রুখ সেলিম], বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

শোভন সোম। (১৯৯৮)। *শিল্পশিক্ষা ও ঔপনিবেশিক ভারত। ভারত তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়*, নিউ দিল্লী।

Alfonso Crujera. (2010). `Electro-etching made easy'. *Alfonso Crujera*. Gran Canaria Island, Spain. Reviewed in 2014.

Alfonso Crujera & Bob Perkin (2013). `The basis of Electro-etching: a simplified explanation'. *Alfonso Crujera*. Gran Canaria Island.

Alfonso Crujera. (2018). *Electro-etching Handbook*. Santa Maria De Guia (Gran Canaria), Spain.

Bernhard Cociancig. (2025). `E-Etching: Art, Science, Craft'. *https://www.laprintmakingsociety.org/2023/10/19/what-makes-a-work-of-art-great-copy/*

Bryony Gomez-Palacio and Armin Vit. (2012). *Graphic Design, Referenced: A visual guide to the language, applications and history of graphic design.* Massachusetts: Rockport Publishers Inc.

Clive Bell. (1914). *Art*. Frederick A. Stokes Company, New York .

Colin Gale. (2009). *Printmaking Handbook Etching and Photopolymer Intaglio Techniques*. A & C Black, Great Britain.

John Berger. (1972). *Ways of Seeing*. Penguin Books Ltd. Great Britain.

Katharina Bossmann, Jose Covarrubias, Asanka S. Yapa, Benjamin Ingle, Stefan H. Bossmann, Jason Scuilla (2021). `An Optimized Nontoxic Electrolytic Etching Procedure for Fine Art Printmaking'. *Leonardo.* https://doi.org/10.1162/leon a 02000.

Liz Chalfin. (2009). `The green print studio'. *https://www.nontoxicprint.com*.